চতুর্থ অধ্যায়

পরিবেশ নীতিবিদ্যা
(Environmental Ethics)

সাধারণত মনে করা হয় যে আমাদের নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়াই সেই ক্ষেত্র যেখানে নৈতিকতার ধারণা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানবেতর জগৎ অর্থাৎ প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ বা অচেতন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কোন নৈতিক সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয় না। আমাদের সমস্ত নৈতিক কর্তব্যই মানুষকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত হয়। আধুনিক যুগে আমাদের নৈতিক জগৎ অনেকটা প্রসারিত হয়েছে। শুধু মানুষ নয় সমগ্র প্রকৃতি যা আমাদের পরিবেশ রচনা করে তা আমাদের নৈতিকতাবোধের কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে। মানুষের মননভিত্তিক নীতিপরিক্রমার ইতিহাসে এ এক নতুন সংযোজন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে একটি নৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে এই উপলব্ধি আধুনিক নীতিদর্শনে যুগান্তরের সূচনা করেছে। নীতিদর্শনের পরিধি ক্রমশ মানবজগতের সীমা ছাড়িয়ে পশু-পাখি-উদ্ভিদ জগৎকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

নীতিবোধের এই ব্যাপ্তি বা প্রসারের একটি পটভূমি আছে। আসলে বিগত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে একটি আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ উপলব্ধি করেছে যে একবিংশ শতাব্দীর মানুষ পরিবেশজনিত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এটি এমন একটি সমস্যা যাকে সে এড়িয়ে যেতে পারে না। তার কারণ পরিবেশেজনিত নানা সমস্যা তার অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে। আমরা আজ যে জগতে বাস করছি সেই জগৎ অতীতে বহুবার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক দেশ-মহাদেশ বিলুপ্ত হয়েছে। একদিকে কোন স্থলভাগ জলমগ্ন হয়েছে, অপরদিকে নতুন পর্বত ভূগর্ভ বিদীর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এইভাবে সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুধু যে পৃথিবীপৃষ্ঠে পরিবর্তন এসেছে তা নয়; এইরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যেমন বহু লক্ষ বছর আগে ডাইনোসরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল এইরকম প্রাকৃতিক কারণেই। প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বুকে বিশাল উল্কাপাতের ফলে যে প্রবল ধূলিঝড় উঠেছিল তা অনেকদিন পর্যন্ত সূর্যকে আড়াল করে রেখেছিল। সূর্যালোকের অভাবে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল উদ্ভিদশূন্য হয়ে পড়ে। খাদ্যের অভাবে ডাইনোসর নামে প্রজাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমরা জানতাম না প্রকৃতির এই দানবীয় শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ বিষয়ে এখনও আমরা অজ্ঞ। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার সামনে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। মানুষ এই ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী নয়। কিন্তু যেখানে আমরাই প্রকৃতির সংহারক সেখানে সেই ধ্বংসের জন্য আমরা আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারি না।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত শতাব্দীতে অথবা আরও কিছু দিন আগে থেকে আমরা প্রকৃতিকে নানাভাবে অশুদ্ধ করছি বা ধ্বংস করছি। আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সাধারণত প্রগতির চিহ্ন বলে মনে করা হয় তারাই পরিবেশ সংক্রান্ত সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। আমরা পরিবেশকে দূষিত করছি। জনসংখ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন ক্ষয়, অরণ্যের বিনাশ, শিল্পায়নের নামে নদী ও সমুদ্রের জলের দূষণ, ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের শুদ্ধতা বা শুচিতাকে নষ্ট করেছে। এর পরিণাম ভয়াবহ। অরণ্যের বিনাশের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করার পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। অরণ্যের বিনাশকে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যও দায়ী করা হচ্ছে। অরণ্য লোপ পাওয়ার ফলে নানা প্রজাতির উদ্ভিদ এবং সেই সঙ্গে বহু কীট-পতঙ্গ যারা সেই সমস্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে থাকে তাদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। শুধু তাই নয় মানুষের ধ্বংসাত্মক নানা কর্মের ফলে একদিকে অক্সিজেনের অভাব ঘটছে, অন্যদিকে জীবের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার উপরে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্ট্রাটোস্ফিয়ারকে পরিবৃত করে রেখেছে যে ওজোন স্তর তা বিনষ্ট হচ্ছে। এর পরিণাম হল অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহে ঘাটতি এবং আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির অপ্রতিহত প্রবাহের প্রভাবে জীবশরীরে দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি।

বায়ুদূষণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে জলদূষণ হয়। জল দূষিত হলে প্রাণী বা উদ্ভিদের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়। জৈব বর্জ্য, কলকারখানার অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, কীটনাশক প্রভৃতি কৃত্রিম জৈব পদার্থ, বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র থেকে নির্গত তেল ইত্যাদির

দ্বারা জল দূষিত হয়। এই জল ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্র, জলজ প্রাণী, এমনকি মানুষের শরীরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও প্রাণীশিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, পরমাণু বিস্ফোরণ প্রভৃতি পরিবেশের দূষণের জন্য দায়ী।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

পিটার সিঙ্গার তাঁর Practical Ethics নামে বইতে এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন—

(ক) একটি নদী গভীর অরণ্য ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের দিকে প্রবহমান। রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই বিপুল জলধারাকে বিশাল শক্তির উৎস বলে মনে করে সেখানে বাঁধ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এর ফলে কর্মসংস্থান ও শিল্পায়ন দেশের অর্থনীতির বনিয়াদকে দৃঢ় করবে।

কিন্তু এই উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য পাইন গাছ আছে যা বহু শতাব্দীর সাক্ষী। অনেক পশু-পাখি এই অরণ্যকে তাদের আশ্রয় বলে মনে করে। এখানে অনেক বিরল প্রজাতির প্রাণী থাকে। তাছাড়া এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ আছে যাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য হয়তো ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে।

প্রশ্ন হল, এখানে কি বাঁধ নির্মাণ করা উচিত? যাঁরা বাঁধ নির্মাণের পক্ষে তাঁদের কাছে বনসম্পদ ও প্রাণীসম্পদ রক্ষার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি বেশী মূল্যবান। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা কি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নিরাশ্রয় বা ধ্বংস করতে পারি?

(খ) অস্ট্রেলিয়ার কাকাডু জাতীয় উদ্যান নানাভাবে সমৃদ্ধ। এই উদ্যানের বনভূমি, তার জলাভূমি এবং জলের প্রবাহ থাকার ফলে সেখানে নানা প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে। সেখানে এমন কিছু প্রজাতির প্রাণী আছে যা বিরল। স্বভাবতই এই উদ্যান প্রাণীবিজ্ঞানীর গবেষণার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া এই উদ্যানের প্রাকৃতিক শোভা কিছু মানুষকে শান্তি দেয়। এই বনভূমি আবার সোনা, প্ল্যাটিনাম এবং ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ। অনেকে এইজন্য মনে করেন যে এই উদ্যানের খনিগর্ভ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আবার অনেকে এইরকম মত প্রকাশ করেন যে উদ্যান খননের ফলে অনেক মানুষের নান্দনিক বোধ আহত হবে, অনেক বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ব্যাহত হবে। তাছাড়া এর ফলে নদী দূষিত হবে, বন্য পরিবেশ বিষাক্ত হবে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ কলুষিত হবে। এই পরস্পরবিরোধী অভিমতের মাধ্যমে একথা বোঝা যায় যে এখানে আমাদের কর্তব্যের দিগ্‌দর্শন করা প্রয়োজন যার জন্য একটি নৈতিক সূত্র আবশ্যক; অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় তার জন্য

নৈতিক নির্দেশের প্রয়োজন আছে। আমাদের এই প্রশ্নের নৈতিক মীমাংসা প্রয়োজন যে আমাদের কর্মের ফলে কোন প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা, অথবা পরিবেশ দূষিত হবে কিনা, অথবা খননকার্যের ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে কিনা, বা এর ফলে জনগণের জীবন আরও সমৃদ্ধ হবে কিনা। এই জাতীয় প্রশ্নের তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনা করে বন্য প্রকৃতির প্রতি আমাদের আচরণকে নৈতিক পথে পরিচালনা করা পরিবেশ নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য।

(গ) ১৯৯৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী 'See Empress' নামে একটি তৈলবাহী জাহাজ ১৪০,০০০ টন অপরিশোধিত তেল বহন করার পথে জলমগ্ন পাহাড়ে ধাক্কা লাগার ফলে জাহাজে ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্রপথে প্রায় অর্ধেক তেল সমুদ্রের জলে মিশে যায়। ঐ জায়গায় সীল, ডলফিন প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই দূষিত জলে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। এইভাবে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর যে ক্ষতি হল তা একটি পরিবেশগত সমস্যা। জাহাজটির তলদেশ যদি পুরু আস্তরণের দ্বারা আবৃত করা হত তাহলে হয়তো প্রকৃতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত।

এই সমস্ত দৃষ্টান্তে একথা স্পষ্ট যে আমরা প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে অনেকটাই উদাসীন। একথা অনস্বীকার্য যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতিসাধক মানুষ নিজেই। প্রগতির স্বার্থে মানুষ এমন সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে যা প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশকে এবং পরোক্ষভাবে তাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এখন যে ক্ষতির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী তার থেকে একমাত্র মানুষই পরিবেশকে মুক্ত করতে পারে। এখানে মূল প্রশ্নটি নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। প্রকৃতি বা পরিবেশের অস্তিত্ব বা সংরক্ষণের প্রশ্নে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। প্রকৃতির প্রতি আমাদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব আছে। আমাদের নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্র শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার পরিধি অনেক ব্যাপক। সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্রও এই পরিধির অন্তর্গত। পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই নৈতিক দায়বদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন আমরা পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি সংজ্ঞা প্রস্তুত করতে পারি। সাধারণভাবে বলা যায় যে **মানুষ ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে নীতিবিদ্যার যে শাখা আলোচনা করে তারই নাম পরিবেশ নীতিবিদ্যা** (Environmental Ethics)। পরিবেশ নীতিবিদ্যা মনে করে যে প্রকৃতির প্রতি আমাদের মনোভাব ও আচরণ নৈতিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন আমার নৈতিক সম্পর্ক আছে সেইরকম প্রকৃতির সঙ্গেও আমার নৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে— এই চেতনা থেকে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হয়েছে।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা যে পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলে তা কি বাস্তবিক নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে উদ্ভূত, অথবা সেখানে আমাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন জড়িত? পরিবেশ সংরক্ষণকে আমরা যদি নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রশ্ন হিসাবে দেখি তাহলে অনেকের মতে নীতিবোধের মূল সত্তাই বিপর্যস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের উল্লেখ করা হয়।

(ক) কোন কোন দার্শনিকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি আমাদের কোনরকম প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকতে পারে না। অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব আছে বলেই আমরা প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধ নিঃস্বার্থ নয়। কীটনাশকের ব্যবহার, জলদূষণ প্রভৃতি আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে। নির্বিচারে অসংযতভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহারের ফলে ক্রমশ আমরাই প্রকৃতিকে জীবনধারণের অনুপযোগী করে তুলেছি। নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মানুষ প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার কথা চিন্তা করে; অর্থাৎ মানুষের প্রতি কর্তব্য আছে বলেই প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাই প্রকৃতির প্রতি কর্তব্যকে পরোক্ষ কর্তব্য বলা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যেহেতু একমাত্র মানুষই নৈতিক বিবেচনার বিষয় তাই একে নৃকেন্দ্রিক (anthropocentric) দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়। মানুষের স্বার্থই এখানে নৈতিক বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দু। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হয় তার নাম anthropocentric ethics বা **নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা**।

অনেকেই এই জাতীয় নীতিবিদ্যাকে যথার্থ নীতিবিদ্যা বলে স্বীকার করেননি। মানবকেন্দ্রিকতা পরিবেশ নীতিবিদ্যায় দু'ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনও তাকে বলা হয়েছে 'Management Ethics' বা ব্যবস্থাপনা নীতিবিদ্যা। প্রকৃতিকে এখানে আমাদের প্রয়োজন নির্বাহের উপকরণ হিসাবে দেখা হয়েছে যাকে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলা হয়েছে তা এখানে কার্যত পরিবেশকে ব্যবহারের নীতিবিদ্যায় (ethics for the use of the environment) পরিণত হয়েছে। এই জাতীয় নীতিবিদ্যা বলতে চায় যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে মানবজীবনের গুণগত উৎকর্ষের উন্নতি হয়।

লক্ষণীয় যে এই জাতীয় নীতিবিদ্যায় মানুষের জীবন ও মানুষের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন কিছুই মূল্যবান নয়। অথচ যথার্থ পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবেতর সমস্ত পদার্থের নৈতিক অবস্থান বা মূল্য স্বীকার করা হয়।

আর একরকম নীতিদর্শনে মানবকেন্দ্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কখনও কখনও মনে করি যে শুধুমাত্র চেতন প্রাণীরই নৈতিক অবস্থান আছে। চেতন

হওয়ার ফলে আমরা তাদের আমাদের সমগোত্রীয় (kin) বলে মনে করি। এই কারণে তাদের সঙ্গে আমাদের নৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে। এইভাবে যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হয় তার নাম 'Kinship Ethics'।

(খ) অনেকে মনে করেন যে যথার্থ পরিবেশ নীতিবিদ্যা রচনা চকরতে হলে মানবকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করতে হবে। একাজ তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা প্রকৃতিকে স্বকীয় মূল্যে মূল্যবান বলে মনে করতে পারব এবং তাদের নৈতিক অবস্থানকে স্বীকৃতি জানাতে পারব। তাই প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের নৈতিক সম্পর্ক বিচার করার ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির প্রসঙ্গ অবান্তর। আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে পারি না কারণ তার অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বের মূল্য ও উদ্দেশ্য আছে। প্রকৃতির নিজস্ব মূল্যের নিরিখে আমরা প্রকৃতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করব। এই জাতীয় নীতিবিদ্যাকে **অ-নৃকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা** (non-anthropocentric ethics) বলা হয়।

উপরোক্ত দু-প্রকার প্রেক্ষিতের তুলনামূলক বিচার করে অনেকে বলেছেন যে নৃ-কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যাকে যথার্থ নীতিবিদ্যার মর্যাদা দেওয়া যায় না। নৈতিক আচরণ তাকেই বলা চলে যে আচরণ কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে করা হয়। কিন্তু যে আচরণের পিছনে স্বার্থবোধ কাজ করে তাকে নৈতিক আচরণ বলা যায় না।

মানুষ পরিবেশের দ্বারা উপকৃত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়— একথা অস্বীকার করা যায় না। একথাও সত্য যে মানুষের জীবনের উৎকর্ষতার জন্য উৎকৃষ্ট পরিবেশের প্রয়োজন হয়। পরিবেশ দূষিত হলে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়। পরিবেশের ক্ষতিসাধনের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয় যা সমগ্র প্রাণিজগতের উপর এবং অবশ্যই মানুষের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু এই স্বার্থবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্য বিচার করি তা হলে তা নৈতিক কর্তব্য বলে গণ্য হবে না। এই বোধ নিয়ে যথার্থ নীতবিদ্যা গঠিত হয় না।

নীতিবিদ্যার যে শাখাকে পরিবেশ নীতিবিদ্যা বলা হয়েছে তা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহারের পরামর্শ নয়, দূষণের আশঙ্কা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করার নীতি নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিশ্চিন্তে বসবাস করার আশ্বাস দেওয়ার শাস্ত্র নয়। পরিবেশ নীতিবিদ্যা স্বার্থচেতনা ছাড়াই পরিবেশ সংরক্ষণ করার কথা বলে— কারণ প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য আছে। প্রকৃতি আমাদের শ্রদ্ধার বিষয় এবং সেই কারণেই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা উচিত।

এই বোধ অতি আধুনিক। প্রাচীন যুগে প্রকৃতি বা বিশ্বের তাত্ত্বিক মর্যাদা সম্পর্কে দার্শনিকদের গভীর অনাস্থা ছিল। যাঁরা প্রকৃতির বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরাও

তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই প্রকৃতি সম্পর্কে চরম উদাসীনতার জন্ম হয়েছিল। প্রকৃতিকে সংরক্ষণের প্রশ্ন তাই তাঁদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি।

দার্শনিকরা অতি প্রাচীন যুগ থেকে তত্ত্ব ও অবভাসের (Reality and Appearance) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যা চিরস্থায়ী নয়, যা স্ববিরোধী তা তত্ত্ব হতে পারে না। প্লেটোর মতে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সামান্য সত্তা বা তত্ত্বের Form ছায়া বা অনুকরণমাত্র। যা অনুকরণ তা অসত্য বা অবভাস। কান্ট বলেছিলেন যে জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। মানুষ তার আত্মগত সাংবেদনিক আকারকে আরোপ করে প্রকৃতিকে জানে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সাংবেদনিক উপাত্ত আমাদের কাছে উপস্থিত হয় তার উপর ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির নানা আকার আরোপিত হলে প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান জন্মে। তাই যে প্রকৃতি বা বিশ্বকে আমরা জানি তা অন্তত আংশিকভাবে আমাদের রচনা। প্রকৃত বিশ্ব আমাদের জ্ঞানাতীত। শুধু তার অবভাসকেই আমরা জানি। আবর ব্রাডলি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, যে সমস্ত পদার্থ দিয়ে জগৎ নির্মিত হয়েছে তা সবই স্ববিরোধী। স্ববিরোধিতা তত্ত্বের পরিচায়ক নয়। জগৎ তাই অবভাস।

জগতের তাত্ত্বিক মর্যাদা সম্বন্ধে এই ধারণা থাকার ফলে বিভিন্ন যুগে প্রকৃতির অবলমূল্যায়ন হয়েছে। যেখানে প্রকৃতি মূল্যহীন সেখানে তাকে সমীহ করা বা সংরক্ষণ করার প্রশ্ন ওঠে না। তাই এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হতে পারেনি।

পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার উৎপত্তির পক্ষে সহায়ক ছিল না। জন পাসমোর (John Passmore) এইরকম অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থে এবং গ্রীসের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে একমাত্র মানুষকেই নৈতিকতার অধিকারী বলে স্বীকার করা হয়েছিল। এর ফলে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হয়নি। পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল বিশ্বাস এই যে প্রকৃতি ও পরিবেশেরও নৈতিক মর্যাদা আছে, এবং সেই কারণে মনে করা হয় যে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা বিশ্বপ্রকৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আমরা এই মনোভাবের পরিচয় পাই না।

বাইবেলে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় যে ঈশ্বর তার নিজের অনুকরণে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত প্রাণী আছে তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার দিয়েছেন। সমস্ত জগৎকে পদানত করার এবং সর্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করার অধিকার মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই লাভ করেছে— "And God said. Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion

over the fish of the sea, and over the fowl in the air, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upto the earth." বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার করলে প্রকৃতির প্রতি মানুষের কোন দায়িত্ব থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

নিউ টেষ্টামেন্টে সেন্ট পলের একটি উক্তিতে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। ঈশ্বর কি গবাদি প্রাণীর কল্যাণের কথা চিন্তা করেন? এই প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছেন তা নেতিবাচক। স্বভাবতই মানুষের পক্ষে গবাদি প্রাণীর হত্যার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। সেন্ট অগাষ্টাইনও নিউ টেষ্টামেন্টে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন যেখানে যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং একটি ডুমুর গাছ নষ্ট করেছেন এবং একদল শূকরকে জলমগ্ন করেছেন। এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে মানুষের পক্ষে প্রাণীহত্যা না করা কুসংস্কার মাত্র। প্রাণী এবং উদ্ভিদকে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারি।

অ্যারিস্টটলের রচনায় দেখা যায় যে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে মর্যাদাগত ভেদের উল্লেখ করেছেন। মানুষ যেহেতু একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী তাই প্রকৃতির সমস্ত পদার্থের মধ্যে মানুষের একটি স্বতন্ত্র স্থান থাকবে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিহীন পদার্থই তার তুলনায় নিকৃষ্ট। অ্যারিস্টটল লিখেছেন— "Plants exist for the sake of animals, and brute beasts for the sake of man." অর্থাৎ উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে প্রাণীর ভোগের জন্য। পশুর সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ভোগের জন্য। সুতরাং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ভোক্তা ও ভোগ্যের সম্পর্ক। প্রকৃতির প্রতি মানুষের কোন নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই।

এই চিন্তাধারা প্রাচীন থেকে মধ্যযুগেও প্রবাহিত হয়েছিল। টমাস অ্যাকুইনাস একই সুরে বলেছলেন যে, "Animals are ordered to man's use in the natural course of things ... Man can use them without any injustice." অর্থাৎ অ্যাকুইনাসের মতেও মানুষের ভোগের জন্য প্রাণিজগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ নির্ভয়ে এবং নির্বিচারে নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে প্রাণীদের ব্যবহার করতে পারে। অ্যাকুইনাসের বক্তব্যে বুক অফ জেনেসিস-এর কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন প্রভুত্ব করার জন্য। তিনি তাঁরই অনুকরণে সৃষ্ট মানুষকে আশীর্বাদ করেছেন যে তারা যেন সৃষ্টির অন্য সকল পদার্থকে পদানত করে (fill the earth and subdue it)।

দর্শনের আধুনিক যুগে দেকার্তও মনে করেছিলেন যে, একমাত্র চেতন পদার্থেরই নৈতিক মর্যাদা থাকতে পারে। মানুষ ছাড়া পশু-পাখি এবং উদ্ভিদ সকলেই প্রাণবান বা জীবন্ত হতে পারে, কিন্তু তারা যন্ত্রবৎ-চেতনা বা চিন্তাশক্তিবিহীন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে পশুর দেহ-ব্যবচ্ছেদের ঔচিত্য নিয়ে

যখন প্রশ্ন উঠেছিল তখন দেকার্ত উল্লিখিত কারণে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। আসলে দেকার্তের দৃষ্টিতে মানবেতর জগৎ Thing বা বস্তু বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

দেকার্তের পরবর্তী যুগে কান্টও বলেছিলেন যে একমাত্র তারই নৈতিক মর্যাদা স্বীকৃত হতে পারে যা বিষয়ী (subject) রূপে গণ্য হতে পারে, যাকে কখনও উপায় (means) রূপে গণ্য করা যায় না। একমাত্র মানুষই লক্ষ্য (end) রূপে গণ্য হতে পারে। (Always treat humanity as an end.) সুতরাং কান্টের মতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা নেই।

এই যে প্রকৃতিকে আমাদের ভোগের উপকরণ (resource) হিসাবে দেখা, তার নৈতিক মর্যাদার অস্বীকৃতির এই ধারাটি বহুদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্য মানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকৃতির যে কোন নৈতিক মর্যাদা থাকতে পারে একথা পাশ্চাত্য চিন্তায় অকল্পনীয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখি মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যতটা সচেতন ছিল প্রকৃতির অধিকার সম্পর্কে ততটা সচেতন ছিল না। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগমা কার্টার মাধ্যমে তৎকালীন ব্যারন সম্প্রদায় নিজেদের প্রাকৃতিক অধিকার (natural rights) দাবি করেছিল, কিন্তু তারা প্রকৃতি অধিকার সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এরও পরবর্তী যুগেও দেখা গেল যে জন লক্, টমাস হবস্ প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌রা একই ভাবে মানুষের সেই সমস্ত অধিকারের কথা বলেছিলেন যা ঈশ্বর প্রদত্ত— যেমন জীবনরক্ষার অধিকার, স্বাধীনতা ও স্বাস্থ্যের অধিকার। মানবেতর প্রাণিজগতের অধিকারের প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর ছিল।

অথচ গ্রীক ও রোমান ধ্রুপদী দার্শনিকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে বিশ্বে মানুষরা একা নয়। অন্যান্য প্রাণীরাও তাদের সহযাত্রী এবং তাদেরও নিজস্ব অধিকার আছে। গ্রীস ও রোমের পতনের পরে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর অধিকার অস্বীকৃত হতে থাকে। তবুও এরই মধ্যে কখনও কখনও বিপরীতমুখী চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন, অভিজ্ঞতাবাদী লক্ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, মানবেতর প্রাণিজগতের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা উচিত। লাইবনিজ বলেছিলেন যে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদ বা ব্যবধান নেই। প্রকৃতির অন্তর্গত সবকিছুই পরস্পর সংযুক্ত। তাই শুধু মানুষ নয়, যা কিছু আমাদের পরিবেশ রচনা করে তারই নৈতিক মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা উচিত। একথার তাৎপর্য হল পরিবেশের প্রতি আমাদের আচরণ নৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে পারি না বা যথেচ্ছভবে তাকে ব্যবহার করতে পারি না। এই বোধের পিছনে কোনরকম স্বার্থবোধ কাজ করা উচিত নয়। প্রকৃতি নিজেই তার সংরক্ষণকে দাবি করে।

কিন্তু প্রকৃতিকে কি বাস্তবিক সংরক্ষণের যোগ্য বলে মনে হয়? প্রকৃতির কি আদৌ কোন স্বগত মূল্য আছে যার ভিত্তিতে তাকে সংরক্ষণের যোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে?

দেকার্ত যদিও মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা অস্বীকার করেছিলেন, তাহলেও সাম্প্রতিককালে আমরা পিটার সিঙ্গারকে দেখি মানবেতর প্রাণীর মুক্তিদাতা রূপে। তিন সমগ্র মানবেতর প্রাণিজগৎকে নৈতিক মর্যাদাহীনতা থেকে নৈতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার অনেক আগে বেন্থাম বলেছিলেন যে মানবেতর প্রাণীকে নৈতিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। একথা হয়তো সত্য যে পশুপাখিরা চিন্তা করতে বা যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। তারা হয়তো কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল— তারা কি ক্লেশ ভোগ করতে পারে? বেন্থাম তাঁর 'The Principles of Morals and Legislation'-এ বলেছলেন: 'The question is not, can they reason? nor can they talk? But can they suffer?" যে প্রাণী মানুষের মতো ক্লেশ ভোগ করতে পারে তার জীবনে ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকবে। সেই ফলাকাঙ্ক্ষা হয়তো শুধুমাত্র এই যে সে ক্লেশ ভোগ করতে চায় না।

পিটার সিঙ্গার মনে করেন যে পশুপাখির মধ্যে যেমন কষ্টবোধ আছে সেইরকম তাদের মধ্যে জীবনকে উপভোগ করার স্পৃহাও আছে। এই দিক থেকে পশুপাখি ও মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। আমরা অকারণে নিজস্ব প্রজতি সম্বন্ধে সম্ভ্রম বোধ করি। 'মানুষ' নামে একটি বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রেই আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্য সীমাবদ্ধ থাকবে এই দাবির কোন ভিত্তি নেই। মানুষের যেমন স্বার্থ ও ফলাকাঙ্ক্ষা আছে, সেইরকম অন্য প্রাণীরও স্বার্থ ও ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। পশুর ক্লেশবোধ তার জীবনের প্রতি আসক্তিকে বোঝায়।

আমরা নানাভাবে পশুর ক্লেশের কারণ হই। একটি প্রসাধন সামগ্রী মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে কিনা তা জানার জন্য অন্য প্রাণীর চোখের উপর তা প্রয়োগ করে আমরা তার ফলাফল লক্ষ করি। আমাদের প্রয়োজনে এইভাবে একটি প্রাণী কষ্টভোগ করে। আবার বাছুরের মাংসকে নরম রাখার জন্য এবং মংসের রঙটি গোলাপী রাখার জন্য সদ্যোজাত বাছুরকে সঙ্কীর্ণ খাঁচায় বন্দী করে যখন কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়, তখন প্রাণীটি যে কষ্টবোগ করে একথা বলা বাহুল্য।

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষের যদি কোন কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে সেটি নেতিবাচক। পশুপাখির প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিদার্শনিকরা মনে করেন যে প্রকৃতির প্রতি আমাদের কিছু ইতিবাচক কর্তব্য আছে। প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা আমাদের

কর্তব্য। কিন্তু অধিকার ছাড়া নৈতিক মর্যাদা দাবি করা যায়। প্রাণীদের সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য কারণ তাদের সংরক্ষিত হবার অধিকার আছে। আমরা এমন কিছুই করতে পারি না যার ফলে এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

মানবেতর প্রাণীর অধিকার ও নৈতিক মর্যাদা

মানবেতর প্রাণীর অধিকারের প্রশ্নটি বিতর্কিত। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। প্রাণীর অধিকার যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নৈতিক মর্যাদাও প্রমাণিত হবে এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য একই সঙ্গে নির্ধারিত হবে।

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় ঔচিত্যের প্রশ্ন আবশ্যিকভাবে জড়িত থাকে। দার্শনিকরা বলেন যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতি বা পরিবেশকে সংরক্ষণ করা উচিত। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলে পরিবেশ নীতিবিদ্যা। কিন্তু আমাদের ঔচিত্যবোধ একমাত্র তারই অভিমুখী হতে পারে যার কিছুমাত্রায় নৈতিক মর্যাদা আছে। মানুষের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন তাই স্বাভাবিক কারণ মানুষের নৈতিক অবস্থান সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু প্রকৃতি বা পরিবেশ— যার মধ্যে পশুপাখি, গাছপালা, নদী, পাহাড় অন্তর্ভুক্ত— তার কি কোন নৈতিক মর্যাদা আছে। এই প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ কি মানুষের কাছে নৈতিক আচরণ দাবি করতে পারে?

একথা সত্য যে আদিতে যে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ছিল। তার নৈতিক জগৎ ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। তবে এই বিস্তার মানবজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারী, কৃষ্ণাঙ্গ ও ক্রীতদাসদের নৈতিক মর্যাদালাভের ইতিহাসের পিছনে যে বোধ কাজ করেছিল তাকে আত্মীয়তাবোধ বলা যেতে পারে। মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রায় একই বোধ কাজ করেছে— তারা আমাদের প্রজাতির মতোই চেতন। একটু আগে যাকে আত্মীয়তাবোধ বলা হয়েছে তাই পিটার সিঙ্গারের রচনায় তিরস্কৃত হয়েছে প্রজাতি-পক্ষপাতিত্ব বলে। আমরা মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মর্যদা স্বীকার করছি এই জন্য যে তারা আমাদের মতোই চেতন। পশুপাখি চেতন— এই যুক্তিতে যদি তাদের নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করা হয় তহলে প্রজাতি-পক্ষপাতিত্ব প্রশ্রয় পাবে। এই পক্ষপাতিত্বকে যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

আসলে চেতনা বা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে কোন প্রাণীকে নৈতিক বিবেচনার যোগ্য বলে প্রমাণ করা যায় না। পশু-পাখির বুদ্ধিবৃত্তি নেই বলে তারা নৈতিক বিবেচনার যোগ্য হবে না— একথার কোন সারবত্তা নেই। প্রজাতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছাড়াও বলা যায় যে বুদ্ধিবৃত্তিকে যদি নৈতিক মর্যাদার শর্ত বল হয় তাহলে যে মানুষ

চেতনাবর্জিত, বুদ্ধিবর্জিত তার নৈতিক মর্যাদা কি অগ্রাহ্য করতে হবে? যে মানুষটি কোমায় (coma) আচ্ছন্ন— যে অবস্থা থেকে প্রত্যাবর্তনের কোন আশাই তার নেই, তার কোনরকম নৈতিক মর্যাদা কি থাকবে না? যে শিশুটির স্নায়ু ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তার নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে?

তাহলে নৈতিক বিবেচনার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার করার জন্য অন্য কোন মানদণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু যে-কোন মানদণ্ডের মধ্যেই প্রজাতি পক্ষপাতিত্ব প্রকট হয়ে ওঠার আশঙ্কা থেকে যায়। মানুষ তার নিজের ছায়া অবলম্বন করে প্রকৃতির মধ্যে সেইরকম ধর্ম আবিষ্কর করার চেষ্টা করে যা তাকে নৈতিক মর্যাদার অধিকারী করেছে। Joel Fenberg তাই 'right' বা অধিকারের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক অধিকারকে বুঝতে চেয়েছেন। মানুষের যেমন নৈতিক অধিকার আছে সেইরকম পশু-পাখি-উদ্ভিদের কি নৈতিক অধিকার থাকতে পারে? আসলে একজনের নৈতিক অধিকার আছে একথা বলার অর্থ হল সেই ব্যক্তির কিছু জিনিসের উপর ন্যায্য দাবি আছে এবং অন্যের কাছে সেই দাবির স্বীকৃতির সম্ভাবনা আছে। অধিকারের স্বীকৃতি দেয় একটি নৈতিক সমাজ যে সমাজের সদস্যরা একটি নৈতিক নিয়মের অধীন। এই নৈতিক নিয়ম এই সদস্যদের উপর নানা কর্তব্য আরোপ করে। এই কর্তব্য হল অন্যের অধিকরের যথাযথ মর্যাদা দান করা। যে সদস্য নৈতিক মর্যাদার অধিকারী তিনিও এই মর্যাদাকে দাবি করতে পরেন।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে নৈতিক মর্যাদা কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন, পশু-পাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতির নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করা যাবে যদি তারা একটি নৈতিক সমাজের সদস্য হয়। নৈতিক সমাজের সদস্য হলে একজন ব্যক্তি বা প্রাণীর পক্ষে নিজের নৈতিক অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু পশু-পাখি বা উদ্ভিদের পক্ষে এইরকম দাবি প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারি না। আসলে নৈতিক অধিকারকে তার পক্ষেই প্রতিষ্ঠা করা বা দাবি করা সম্ভব হয় যার আত্মসম্মান আছে, যে নিজের স্বগতমূল্য সম্পর্কে সচেতন। মানুষ তার নৈতিক অধিকারের কথা ভাবতে পারে কারণ তার আত্মমর্যাদা বোধ আছে। দর্শনে 'ব্যক্তি' শব্দটি এই আত্মসম্মানপূর্ণ সত্তাকেই বোঝায়। মানুষ 'ব্যক্তি' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। তাই একমাত্র মানুষের পক্ষেই নৈতিক অধিকার দাবী করা সম্ভব। কোন অর্থেই পশুপাখি প্রভৃতিকে 'ব্যক্তি' বলা যায় না। তাই তাদের নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর।

নৈতিক অধিকারের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই অধিকার ভঙ্গ হলে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ যার অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে সে আইনের সাহায্যে অভিযোগ করতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। মানুষের বিভিন্ন

মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে সে আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আদালত সেই ক্ষতিপূরণের অর্থ তাকে অর্পণ করতে পারে। পশুপাখি বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিকার ভঙ্গের ফলে অভিযোগ করা বা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার প্রশ্ন ওঠে না। এই কারণে তাদের নৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি অনর্থক বলে মনে হয়।

অনেকে মনে করেছেন যে নৈতিক মর্যাদা বা অধিকারের যে শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাদের অসম্ভব শর্ত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পশু-পাখি বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অধিকার ভঙ্গজনিত ক্ষতিপূরণ দাবি করার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তারা ভাষা প্রয়োগে অক্ষম। আমরা কি ভাষা প্রয়োগের সক্ষমতাকে নৈতিক মর্যাদার মানদণ্ড বলতে পারি? একটি প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র কথা বলতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ও একই ভাবে ভাষাহীন। শুধুমাত্র এই কারণে তাদের অধিকারহীন বলা যায় না। একজন নবজাতকও কথা বলতে অক্ষম। কিন্তু সেইজন্য তার অধিকার অস্বীকার করা অসঙ্গত। একজন আইনবিদ্ তার হয়ে তার অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। একটি নবজাতকের মতো একজন জড়বুদ্ধি মানুষ অথবা অচেতন উদ্ভিদপ্রায় মানুষটিও নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় অক্ষম বা নিরুদ্যম। তবুও তাদের পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত প্রতিনিধি তাদের অধিকার সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে পারে। এইভাবে অসহায় প্রকৃতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বে অনেক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছে যেমন 'Friend of the earth', 'Environmental Defence Fund', 'Sierra Club' প্রভৃতি। তাহলে মানবেতর প্রকৃতির আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? বাধা সম্ভবত এখানেই যে প্রকৃতি নিজের উদ্যোগ তার অধিকারের দায়িত্ব বহন করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করে না। প্রকৃতির অনুরোধে কোন প্রতিষ্ঠান প্রকৃতির স্বার্থে তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য সক্রিয় হয় না।

এই দিক থেকে বিচার করলে একটি মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে জড়বস্তুর কোন অমিল নেই। আমরা অনেক জড় বস্তুকে সংরক্ষণ করতে চাই। কিন্তু একথা সত্য যে কোন জড়বস্তু সংরক্ষণের অধিকার নিয়ে আসে না। জড়বস্তুর স্বার্থবোধ, মঙ্গল বা ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। অনেকেই এইরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে অধিকারের প্রশ্ন সেখানেই যথার্থ হয় যেখানে interest বা ফলাকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গ আছে। ফলাকাঙ্ক্ষার জন্য চাই চেতনা যা নানা কামনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রাণি-জগতের ক্ষেত্রে ফলাকাঙ্ক্ষার কথা কল্পনা করা সম্ভব হলেও উদ্ভিদ জগৎ, যা কামনা বর্জিত, তার সম্বন্ধে ফলাকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহের প্রশ্ন ওঠে না। তাই উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। তাই উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন অর্থহীন হতে বাধ্য। পশু-

পাখির ক্ষেত্রে ফলাকাঙ্ক্ষার কথা কল্পনা করা সম্ভব হলেও উদ্ভিদ জগৎ, যা কামনা বর্জিত, তার সম্বন্ধে ফলাকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহের প্রশ্ন ওঠে না। তাই উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্ন অর্থহীন হতে বাধ্য। পশু-পাখির ক্ষেত্রে ফলাকাঙ্ক্ষার প্রশ্ন অবান্তর নয়। তাদের সুখবোধ আছে, বেদনার অনুভূতি আছে। উদ্ভিদে আছে শুধু জৈবিক প্রবণতা যা অনেকটাই যান্ত্রিক। উদ্ভিদের ফলাকাঙ্ক্ষা বা সচেতন কামনা নেই, তাই তার তৃপ্তি বা হতাশাও নেই। উদ্ভিদের চাহিদা নেই। তাই অধিকারের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এখানে 'চাহিদা' শব্দটির তাৎপর্য বিচার করা প্রয়োজন। উদ্ভিদ জল চায়, মাটি চায়, আলো চায়। কিন্তু এ চাওয়া সচেতন কামনা নয়। এখানে শুধুই জৈবিক প্রয়োজনের প্রশ্ন। উদ্ভিদের এই জৈবিক প্রশ্ন তার অধিকারের ভিত্তি হতে পারে না। আবার যেখানে অধিকার নেই সেখানে মানুষের দায়িত্ব বা কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠে না। একথার অর্থ এই নয় যে আমরা প্রকৃতির উদ্ভিদ সম্পদকে নির্বিচারে ধ্বংস করব। কিন্তু তার পিছনে উদ্ভিদ জগতের অধিকার কাজ করে না। হয়তো ব্যবহারিক বুদ্ধি আমাদের সংরক্ষণে উৎসাহিত করে।

তাহলে প্রকৃতি রাজ্যের মানবেতর অংশের নৈতিক মর্যাদার প্রশ্ন অবান্তর বলে মনে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ নীতিবিদ্যা অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নও অবান্তর হয়ে পড়বে। তাই অনেকেই মনে করেছেন যে মানবেতর প্রকৃতির নৈতিক মর্যাদা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করার আগে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মিল বলেছিলেন যে যুগান্তকারী যে-কোন ধারণা তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়— বিদ্রূপ, আলোচনা ও স্বীকৃতি (ridicule, discussion, adoption)। যা একসময়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল তাই কালক্রমে প্রচলিত ধারণা বলে স্বীকৃতি লাভ করে। একসময় পাশ্চাত্যে ভূমিহীন, কৃষ্ণাঙ্গ বা নারীদের কোন মর্যাদা বা অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু আজ তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য বহন করে।

নৈতিক মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে আমরা যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়ে থাকি একথা অনস্বীকার্য। আমরা যেন 'মানুষ' নামে একটি বিশেষ প্রজাতির ক্ষেত্রে নৈতিক মর্যাদাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এই সীমাবদ্ধতা যুক্তিহীন। শুধুমাত্র মানুষের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে নৈতিকতার সহচারী ধর্ম বলে মনে করা সঙ্গত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে Routley-র একটি মন্তব্য লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন— আমরা যদি নৈতিক সমিতির (moral club) দরজা শুধুমাত্র তাদের জন্যই খোলা রাখি যাদের চোখ নীল এবং চুল সোনালী তাহলে আমরা যতটা সঙ্কীর্ণ হব ঠিক ততটাই সঙ্কীর্ণ

হয় যদি একটি বিশেষ প্রজাতির প্রাণীকে অর্থাৎ একমাত্র মানুষকে সেখানে প্রবেশাধিকার দিই। আমরা মানুষেরা একটি বিশেষ প্রজাতির প্রাণী। আমাদের কতকগুলি প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু নৈতিক মর্যাদার প্রশ্নে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই কি অপ্রাসঙ্গিক নয়? মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার মধ্যে সমস্ত সম্পর্কই আপতিক, কখনও আবশ্যিক নয়। মানব প্রজাতির কিছু আপতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে অন্য প্রজাতিকে নৈতিক মর্যাদাশূন্য বলা শুধু অনুচিত নয়, অযৌক্তিক।

একেই আমরা মানবীয় আগ্রাসন বা human chauvinism বলি। কোনরকম আগ্রাসনকেই অনুমোদন করা যায় না। মানুষের মধ্যে অবশ্যই একটি প্রজাতিগত স্বাতন্ত্র আছে— যা তার বুদ্ধিবৃত্তি। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে সব মানুষ কি বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী? যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির দাবি করতে পারে তবুও এই বৃত্তিটি মানুষকে নৈতিক মর্যাদা দেবে কেন? পশুপাখির বুদ্ধিবৃত্তি না থাকলেও তাদের অন্য কোন ধর্ম থাকতে পারে যার মূল্য বা গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক মর্যাদার প্রশ্নে এই ধর্মকে কেন অপ্রাসঙ্গিক বলা হবে? বুদ্ধিবৃত্তির জয়গান এবং নানা পশুধর্মের অবজ্ঞাই তো এক্ষেত্রে মানুষের আগ্রাসন।

মানুষের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যা বলা হল তা যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে মানুষকে নতুন করে প্রকৃতিকে সমীহ করতে শিক্ষা করতে হবে। আমদের নৈতিক সঙ্ঘে তদের প্রবেশাধিকার নাও দিতে পারি, কিন্তু নিজের বিচারবিহীন অসংযত আচরণের দ্বারা আমরা যেন তাদের ক্ষতিসাধন না করি। পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তখনই নৈতিক মাত্রা লাভ করবে।

আমরা দেখেছি যে মানুষ এবং প্রকৃতির অবশিষ্ট অংশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের কল্পনা নানাভাবে নিন্দিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই কল্পনা মানুষের ভিত্তিহীন মহত্ত্বকে প্রশ্রয় দিয়েছে। অথচ মানুষ এমন একটি প্রাণী যার সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্গত অন্যান্য প্রজাতির অনেক সাধর্ম্য আছে, যদিও মানুষের মধ্যে এমন কিছু কিছু বৃত্তি আছে যা অন্য প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে দুর্লভ। আমরা অন্তত তিনভাবে অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত— উৎপত্তির দিক থেকে, সাদৃশ্যের দিক থেকে এবং পরস্পরিক নির্ভরতার দিক থেকে। একথা স্বীকার করলে বলা যায় যে প্রকৃতিকে শোষণ করার বা ধ্বংস করার কোন অধিকার মানুষের নেই। দার্শনিকরা অবশ্য মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে প্রমাণ করার জন্য অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে পল টেলর, লিওপোল্ড, নায়েস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের রচনাতেই পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা (biocentric ethics) রূপে প্রকাশিত হয়। প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা এক জাতীয় তত্ত্বকে বোঝায় যেখানে প্রাণের স্বগতমূল্য স্বীকৃত হয়।

প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার সর্বপ্রথম পরিচয় পাওয়া যায় অ্যালবার্ট শোয়িৎজারের একটি নীতিতে যাকে তিনি 'reverence for life' বা প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি বলেছেন। এই নীতিটিকেই পরবর্তী যুগের প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার (biocentric ethics) অগ্রদূত বলা হয়। সোয়িৎজারই সর্বপ্রথম প্রকৃতির নিজস্ব মূল্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা তাঁর মতে নীতিবিদ্যার ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে সর্বত্র প্রাণের স্পন্দনের উপলব্ধি থেকে আমাদের নৈতিকতার সূত্রপাত হতে পারে। যা কিছু প্রাণবান তারই স্বগতমূল্য আছে এবং তাই আমাদের মধ্যে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে।

Schweitzer প্রকৃতিকে তার বিভিন্ন রূপের মধ্যে দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর নিজের মধ্যে যেমন জীবনধারণের স্পৃহা আছে সেই একই স্পৃহা অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেও বর্তমান। তাই সকল প্রাণবান পদার্থের প্রতি আমাদের সমান সম্ভ্রম থাকা উচিত। তিনি বলেছিলেন যে মানবচেতনা সম্বন্ধে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে সে উপলব্ধি করে যে সে প্রাণবান এবং তার মধ্যে জীবনধারণের প্রবল আগ্রহ বর্তমান। মানুষ বা মানবচেতনা এইরকম নানা প্রাণের দ্বারা পরিবৃত যা একইভাবে জীবনধারণ করতে চায়। আমার বাঁচার ইচ্ছার মধ্যে যেমন আরও প্রাণ প্রাচুর্যের প্রতি স্পৃহা আছে সেইরকম আমার চতুর্দিকে একই স্পৃহা বর্তমান— 'I am life which wills to live, and I exist in the midst of life which wills to live. ... Just as in my own will-to-live there is yearning for more life ... so the same obtains in all the will-to-live around me.'[১]

সুতরাং প্রাণেরও একটি গভীর তাৎপর্য আছে। যা প্রাণময় তা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু Schweitzer-এর ধারণা অন্তত দুটি কারণে দুর্বল। প্রথমত একথা স্বীকার করা কঠিন যে একজন মানুষ আমার মধ্যে যে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে একটি বিষাক্ত কীটও সেইরকম শ্রদ্ধাবোধ আমার মধ্যে জাগ্রত করবে। তাহলে কি বিভিন্ন প্রাণবান পদার্থের মধ্যে আমরা মর্যাদার তারতম্য স্বীকার করব? সেক্ষেত্রে Schweitzer-এর মূল বক্তব্যই অগ্রাহ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, কোন বস্তু বা প্রাণী কোন কারণে আমাদের শ্রদ্ধেয় হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা তাদের প্রতি আমার কর্তব্য নির্ধারিত হয় না। আলোচ্য তত্ত্বে পদার্থের একটি স্বগত ধর্মকে জানা যায়, আমাদের কর্মনীতিকে জানা যায় না। বস্তুস্থিতি (fact) ও মূল্যের (value) মধ্যে যে ব্যবধান বিভিন্ন নীতিদর্শনে কথিত হয়েছে বর্তমান মতবাদ তাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

১. A. Schweitzer– *Out of my Life and Thought.*

Schweitzer-এর পরে প্রাণকেন্দ্রিক (biocentric) নীতিবিদ্যাকে যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দেন পল টেলর তাঁর Respect for Nature নামক গ্রন্থে। শোইৎজর প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি আমাদের কর্তব্যের যোগসূত্রের ভিত্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। প্রকৃতির প্রাণ থাকতে পারে; কিন্তু সেই কারণে আমরা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব কেন অথবা তাকে সংরক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হব কেন?

টেলরের মতে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া যথোচিত হয় এবং আমাদের চরিত্র নৈতিক বলে গণ্য হয়। এই বিষয়ে টেলর-এর ব্যাখ্যা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমত, তাঁর মতে সমস্ত প্রাণহীন বস্তুর নিজস্ব মঙ্গল আছে। (কিন্তু নিজস্ব মঙ্গল থাকলেও তার স্বগত মূল্য প্রমাণিত হয় না। আমরা তখনই একটি বস্তুর স্বগত মূল্যের কথা বলতে পারি যদি একই সঙ্গে একথা বলা যায় যে বস্তুটির নৈতিক মর্যাদা আছে এবং বস্তুটি তার প্রতি নৈতিক আচরণ দাবি করতে পারে।) টেলর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণকেন্দ্রিক বলেছেন 'biocentric out look on nature.' এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে টেলর সমস্ত প্রাণীর স্বরূপগত মূল্য স্বীকার করেন এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের চূড়ান্ত নৈতিক মনোভাব (ultimate moral altitude) বলে উল্লেখ করেন। টেলর বলেছেন যে যা কিছু প্রাণবান তার মধ্যে মঙ্গলময় পরিণতির সম্ভাবনা আছে। একটি শিশুর মধ্যে এই সম্ভাবনা থাকলেও পাথর বা বালির স্তূপের মধ্যে তা নেই। তাই প্রাণীর ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের কথা বা সংরক্ষণের কথা প্রাসঙ্গিক হলেও নিষ্প্রাণ জড় বস্তুর ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক নয়।

টেলর তাঁর পরবর্তী যুক্তিতে বলেছেন যে বিশ্বের প্রতিটি প্রাণবান বস্তুর অস্তিত্বের একটি উদ্দেশ্য (end) আছে। এই উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধি, বিকাশ, বংশরক্ষা প্রভৃতি। যার প্রাণ আছে সেই চেষ্টা করে নিজের অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। একটি প্রাণীর জীবন এইভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অভিমুখী (goal-oriented) বলে মনে হয়।

কিন্তু একটি প্রাণীর নিজস্ব মঙ্গলভাবনা (good of its own) আছে— এই বর্ণনামূলক দাবির ভিত্তিতে কি একথা বলা যেতে পারে যে তার প্রতি আমাদের নৈতিক কর্তব্য আছে? কোন প্রাণীর নিজস্ব মঙ্গল ভাবনা থাকলেই তার নৈতিক মর্যাদা থাকে না।

টেলরের মতে প্রাণীর স্বগত মূল্যের ধারণাই তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের নির্ণায়ক। যে পদার্থের নিজস্ব মূল্য আছে তাদের নৈতিক মর্যাদাও স্বীকার করতে হয়। এর ভিত্তিতে টেলর বলেছেন যে মানুষের নৈতিক কর্তব্য হল এই মূল্যবান প্রাণকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করা। টেলরের এই প্রাণকেন্দ্রিক তত্ত্বের মূলে আছে চারটি গভীর বিশ্বাস—

(ক) এই বিশ্বে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষেরও একটি স্থান আছে।

(খ) সমস্ত প্রজাতি, এমনকি 'মানুষ' নামক প্রজাতিও পরস্পর নির্ভরশীল।

(গ) সমস্ত প্রাণী তাদের নিজস্ব ভঙ্গীতে নিজেদের জীবনের মঙ্গলসাধন করে।

(ঘ) মানুষকে অন্য প্রাণীর তুলনায় উৎকৃষ্ট বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

এই বিশ্বাসগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করলে বাস্তুতন্ত্রের অনেক কিছুই মিথ্যা হয়ে যাবে।

এই চারটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে টেলর প্রকৃতির প্রতি মানুষের চারটি কর্তব্যের কথা বলেছেন— এই কর্তব্যগুলি আবার চারটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত— ক্ষতি না করার নীতি, হস্তক্ষেপ না করার নীতি, বিশ্বস্ততার নীতি এবং ক্ষতিপূরণের নীতি। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল—

(ক) কোন প্রাণীর ক্ষতি না করা।

(খ) কোন প্রাণীর স্বাধীন জীবনে হস্তক্ষেপ না করা।

(গ) প্রলোভন দেখিয়ে বন্য প্রাণীকে প্রবঞ্চিত না করা।

(ঘ) এই নিয়মগুলি ভঙ্গ করে যদি আমরা প্রাণিজগতের ক্ষতি করি তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে সেই ক্ষতিপূরণ করা।

টেলরের মতে প্রাণিজগতের ক্ষতিসাধন না করাই (duty of non-maleficence) আমাদের মুখ্য কর্তব্য।

টেলরের প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা শেইৎজারের বক্তব্যের তুলনায় উন্নত বলে মনে হয়। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার আবেগ নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না। টেলর প্রমাণ করেছেন যে প্রাণিজগৎ মানবজগতের মতোই মূল্যবান এবং তাদের নৈতিক তাৎপর্যও সমান। শেইৎজার প্রাণিজগতের নিজস্ব মূল্য এবং নৈতিক মর্যাদাকে প্রমাণ করেননি। টেলর এখানে সফল।

কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ প্রাণবান তারাই কি শুধু আমাদের পরিবেশ রচনা করে? আমরা যে পরিবেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত সেখানে যেমন প্রাণী আছে সেইরকম উদ্ভিদ ও অন্যান্য জড়বস্তুও আছে। প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যের কথা বলে না, তার একটি অংশের সঙ্গে আমাদের নৈতিক সম্পর্কের কথা বলে। এখানেই প্রাণকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার অসম্পূর্ণতা।

এই অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার **(ecocentric ethics)** জন্ম হয়। এই নীতিবিদ্যার বৈশিষ্ট্য তার সামগ্রিকতা (holistic)। সমগ্র 'বাস্তুতন্ত্র'ই (ecosystem) এই নীতিবিদ্যার বিষয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আর্নস্ট হেকেল

নামে একজন জার্মান জীববিজ্ঞানী 'ecology' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি দুটি গ্রীক শব্দ 'oikos' এবং 'logos'-কে সংযুক্ত করে এই শব্দটি গঠন করেন যাদের অর্থ যথাক্রমে আশ্রয় বা বাসস্থান অথবা বাস্তু এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা। সুতরাং 'ecology' শব্দটির দ্বারা আমরা এমন একটি বিজ্ঞানকে বুঝি যা প্রকৃতির আশ্রয় বা পরিবেশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে। এটি একটি বিজ্ঞান যা যাবতীয় প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ককে এবং প্রাণিজগতের সঙ্গে অচেতন প্রকৃতির সম্পর্ককে বিচার করে।

ভূমিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যা

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় Aldo Leopold একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। 'Ecology' বা 'বাস্তুবিদ্যা' যখন বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তখন থেকেই আমাদের নৈতিক চিন্তায় মৌলিক পরিবর্তন আসে। লিওপোল্ড একমাত্র দার্শনিক যিনি বাস্তুবিদ্যাকে স্পষ্টভাবে নীতিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনিই প্রথম Land Ethic বা ভূমিকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার ধারণা প্রবর্তন করেন।

লিওপোল্ড-এর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংগ্রহ 'A Sand County Almanac'-এর অন্তর্গত 'The Land Ethic' নামক প্রবন্ধে তিনি প্রথম বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার (ecocentric ethics) সুবিন্যস্ত বর্ণনা দান করেন। সেখানেই তিনি আমাদের নীতিবোধকে ভূমি, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

লিওপোল্ড-এর মতে land বা ভূমি শুধুমাত্র প্রাণহীন জড়বস্তু নয় যাকে মানুষ তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। ভূমি নিছক মৃত্তিকা নয়। ভূমি হল শক্তির উৎস— যে শক্তি মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রবাহিত হচ্ছে। লিওপোল্ড বলেছেন— "Land, then, is not merely soil, it is a fountain of energy flowing through a circuit of soils, plants, and animanls." Land বা ভূমি শব্দটি তাদের সকলকেই বোঝায় যারা ভূমি অধিকার করে রয়েছে। মানুষ তদেরই একজন। তাই মানুষকে বিশেষ নৈতিক মর্যাদা দেওয়ার কোন কারণ নেই। বিশ্বপ্রকৃতি একটি বৃহৎ পরিবার— a biotic community। লিওপোল্ড-এর মতে যা কিছু এই বৃহৎ প্রকৃতি-পরিবারের স্বার্থ ও স্থায়িত্ব রক্ষা করে তাই ভালো। "A thing is right when it tends to preserve he integrity sterility and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends

otherwise." লক্ষ কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে প্রকৃতি আজ এই রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার অতি বিনম্র ও সংযত হওয়া উচিত। প্রকৃতির পরিবর্তন বা বিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন আনে তা অতর্কিত এবং ভীষণ। তখনই প্রকৃতিতে বিপর্যয় আসে। তাই আমরা যেন প্রকৃতি ও তার পরিবারের উপর অত্যাচার না করি।

আমরা কিছু কিছু প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজেদের প্রয়েজনে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের স্থায়ী সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় না। আমরা যদিও জ্বালানীর জন্য গাছকে ব্যবহার করি তাহলেও এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। আসলে প্রকৃতির রাজ্যে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর জীবন রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। একটি বটগাছ মারা যায়, কিন্তু 'বটগাছ'-এর মৃত্যু হয় না। তাছাড়া গাছকে যখন জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তা ভস্মে পরিণত হয় যা কালক্রমে সার হিসাবে জমিকে উর্বর করে এবং পরিণামে আরও একটি গাছের জন্মে সাহায্য করে। সুতরাং ভূমি নীতিবিদ্যা বিশ্বাস করে যে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক বস্তুকে ব্যবহার বা ভোগ করতে পারে। লিওপোল্ড এখানে পিটার সিঙ্গার, টম রেগান বা ক্রিষ্টোফার ষ্টোনের মতো প্রাণী ও উদ্ভিদের নিরঙ্কুশ অধিকারকে স্বীকার করেননি। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদের নৈতিক অধিকার স্বীকার করে একই সঙ্গে মানুষের ভোগের অধিকারকে দাবি করা যায় না। অবশ্য এর ফলে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ লিওপোল্ড এখানে যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তাকে সার্বিক বা holistic বলা হয়। তিনি land community বা ভূমি পরিবারের নৈতিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন; এই পরিবারের ব্যক্তি সদস্যদের ভোগ্য বস্তুরূপে ব্যবহার করলেও পরিবারের প্রতি আমাদের সমীহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রকৃতির রাজত্বে পারস্পরিক ভোগের ব্যবস্থাটিও প্রকৃতির নিজস্ব। প্রকৃতির এই পরিবারের স্বরূপকে বোঝাবার জন্য লিওপোল্ড 'biotic pyramid' বা 'land pyramid'-এর ধারণা উপস্থিত করেছেন। এই পিরামিডকে তিনি একটি অতি সংগঠিত প্রাকৃতিক গঠন (highly organised structure) বলেছেন। এই পিরামিডের সর্বনিম্নস্তরে আছে ভূমি বা মৃত্তিকা; তার উপরের স্তরে আছে যথাক্রমে উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, পাখি, তীক্ষ্ণ দাঁতাল প্রাণীর স্তর। এর উপরের স্তরে আছে নানা প্রাণী যারা মাংসাশী। একটি স্তরে যারা আছে তারা তার উপরের স্তরকে ভোগ করে। ভোক্তার তুলনায় ভোগ্যের সংখ্যা যেহেতু বেশি হওয়া প্রয়োজন তাই এই পরিবারের গঠন বা আকৃতিকে পিরামিড সদৃশ বলা হয়েছে। খাদ্যের জন্য এই নির্ভরশীলতাকে খাদ্য শৃঙ্খল বা food chain বলা হয়েছে।

এই মতবাদ— যা ভূমিনীতিবিদ্যা বা land ethic নামে পরিচিত— তা আমাদের মধ্যে এক নৈতিক মনোভাব সৃষ্টি করে যার ফলে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির সব কিছুকেই সংরক্ষণ করার প্রবণতা জন্মলাভ করে। এই মতবাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে প্রকৃতির প্রতি যে নৈতিকবোধ বা কর্তব্যের কথা বলা হয় তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। এখানে একথা বলা হয়নি যে আমরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রকৃতিকে রক্ষা করব। বরং এখানে একথাই বলা হয়েছে যে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব প্রকৃতির উপরই থাকুক। আমাদের কর্তব্য এটুকু দেখা যে প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা যেন কোনভাবেই আমাদের দ্বারা বিঘ্নিত না হয়।

তাছাড়া আমরা দেখেছি যে মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মধ্যে একজন। অন্যান্য বস্তুর তুলনায় সে অধিক মর্যাদা দাবি করতে পারে না। মানুষ প্রকৃতির অন্য সমস্ত বস্তুর সঙ্গে সমান। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় এইরকম দৃষ্টিভঙ্গীই কাম্য।

প্রকৃতি-পরিবারের এই ধারণাটিই আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন J.B. Callicott। এই আমেরিকান দার্শনিক লিওপোল্ড-এর ধারণাকে আরও যুক্তিনিষ্ঠ করেছেন। প্রকৃতির ভারসাম্য কেন রক্ষা করা উচিত তার সমর্থনে তিনি একটি নতুন যুক্তি উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে আবেগ বা অনুভূতি (sentiment) নৈতিকতার ভিত্তি। মানুষের আবেগ থেকেই নীতিবোধের জন্ম হয়। মানুষের বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সহানুভূতির অনুভূতিই প্রধান। সহানুভূতি থেকেই নৈতিকতার জন্ম হয়। সহানুভূতির বন্ধনে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সঙ্গে আবদ্ধ হয়। এর ফলে একটি সামাজিক জগতের সৃষ্টি হয়। সহানুভূতির ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হতে থাকে সামাজিক জগতের পরিধিও তত বিস্তৃত হয়। তখন সমগ্র প্রকৃতি এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়। আমরা তখনই বোধ করি যে এই বিশাল পরিবারের প্রতি আমাদের কিছু নৈতিক কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে। আমরা পরিবেশকে ধ্বংস বা নিঃস্ব হতে দিতে পারি না। পরিবেশকে সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। এই সহানুভূতির মধ্য দিয়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্ম হয়।

ভূমি নীতিবিদ্যার সামগ্রিকতা (holism) কিছু কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে এই মতবাদ সমগ্রের স্বার্থকেই প্রধান বলে মনে করেছে, যার ফলে ব্যক্তির স্বার্থ অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হয়েছে। পরিবারের সামগ্রিক স্বার্থ যদি প্রধান হয় তাহলে পরিবারের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থকে উৎসর্গ করা নিন্দনীয় হবে না। লিওপোল্ড তাই প্রাণী-সম্প্রদায়ের স্থায়িত্বের স্বার্থে কিছু কিছু প্রাণী শিকারকে অনুমোদন করেছেন। সেক্ষেত্রে মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যের জন্য তিনি কি কোন কোন ক্ষেত্রে মানব হত্যাকেও অনুমোদন করবেন? এই কারণে

লিওপোল্ডের অভিমতকে কখনও 'totalitarian' এবং কখনও আরও তীব্র ভাষায় 'environmental fascism' বলা হয়েছে।

অপর একটি অভিযোগে বলা হয়েছে যে আবেগের মতো অস্থির ভিত্তির উপর নীতিবিদ্যা নির্মাণ করা যায় না। মানুষ যেমন সহানুভূতিপ্রবণ হয় সেইরকম তার মধ্যে স্বার্থপরতা ও ঘৃণার প্রবণতাও আমরা লক্ষ করেছি। মানুষ যেমন মানুষের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করতে সমর্থ সেইরকম সে বিভেদ সৃষ্টিতেও পারদর্শী। অতএব পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে যে আবেগের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা সার্বজনীন নয়। মানুষ যে ভূমির প্রতি তার সহানুভূতিকে প্রসারিত করবে তা নয়। তার বিদ্বেষ বা স্বার্থপরতাও সেখানে প্রসারিত হতে পারে। মানুষের স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়। আমরা দেখেছি নিজের অথবা পরিবারের আবাসনের স্বার্থে মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করেছে যার ফলস্বরূপ কোন কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। তাই অনেকে বলেছেন যে নৈতিকতার ভিত্তিতে মানব-মনস্তত্ত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা সঠিক নয়। বিশেষভাবে কান্টের অনুগামীরা এই সমালোচনাকে সমর্থন করবেন।

গভীর বাস্তুবিদ্যা
(Deep Ecology)

Aldo Leopold-এর ভূমিনীতিবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ 'A sand County Almanac' ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৭০ সাল থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা নতুন ভাবে বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন। তার ফলে পরিবেশকে কেন্দ্র করে এক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যাকে গভীর ও সর্বাত্মক বাস্তু আন্দোলন (deep and holistic ecological movement) বলা চলে। এই আন্দোলনের সঙ্গে Arne Naess-এর নাম বিশেষভাবে যুক্ত।

Naess সর্বপ্রথম deep বা গভীর এবং shallow বা অগভীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য করেন। এদুটি দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তুর প্রতি দু-প্রকার মানসিকতাকে বোঝায়। Naess যাকে অগভীর বাস্তুবিদ্যা বলেছেন তা মূলত মানুষের কল্যাণের চিন্তার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ। তাই এই আন্দোলনে দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। বাস্তু সংরক্ষণ অবশ্যই এই অগভীর আন্দোলনের উদ্দেশ্য। তবু একথা অনস্বীকার্য যে বাস্তুর প্রতি এই মনোভাব সম্পূর্ণভাবে মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric)। কারণ, বাস্তুর সংরক্ষণের পিছনে মানবিক স্বার্থরক্ষার চিন্তা

উপস্থিত থাকে। যেমন, জলকে দূষণমুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছে, কারণ তার ফলেই আমরা বিশুদ্ধ জল পান করতে পারি।

Naess যাকে 'deep ecology' বলেছেন তাকে গভীর বলার কারণ এই যে এখানে পরিবেশগত সমস্যার কারণকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। রোগের লক্ষণকে দূর করার জন্য তার কারণকে দূর করা প্রয়োজন। অগভীর বাস্তুবিদ্যা দূষণ ও নানাপ্রকার ক্ষয়ের উল্লেখ করেছে এবং এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কিন্তু তার মানবিক ও সামাজিক কারণকে অনুসন্ধান করেনি।

গভীর বাস্তুবিদ্যা মনে করে যে সমসাময়িক পরিবেশগত সঙ্কটের কারণ এক দার্শনিক সঙ্কটের মধ্যে নিহিত আছে। আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সঙ্কট দূর হতে পারে। এই পরিবর্তন মানুষের ব্যক্তিগত এবং কৃষ্টিগত ও ভাবাদর্শগত পরিবর্তন; অর্থাৎ পরিবেশ নীতিবিদ্যা মূলত আমাদের মূল্যবোধের পরিবর্তনকে প্রত্যাশা করে। এই পরিবর্তনের জন্য নতুন কোন বোধের উন্মেষের প্রয়োজন হয় না। বরং তাকে অতি প্রাচীন চিন্তার পুনর্জাগরণ বলা চলে (reawakening of something very old)— যে প্রাচীন চিন্তায় বারবার বিশ্বের একাত্মতাকে স্বীকার করা হয়েছে। এ এক বাস্তুচেতনা (ecological consciousness)। এরই পরিণামে এক নতুন বিশ্বদর্শনের জন্ম হয় যার নাম "eco-philosophy'।

Naess ও George Sessions গভীর বাস্তুনীতিবিদ্যার আলোচনায় কয়েকটি নীতি বা সূত্রের উল্লেখ করেছেন—

(১) জগতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর কল্যাণ ও বিকাশের নিজস্ব মূল্য আছে। মানবেতর জীবনের মূল্য মানুষের কাছে তার উপযোগিতার উপর নির্ভর করে না।

(২) জীবনের বৈচিত্র্য ও পরিপূর্ণতা এই মূল্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

(৩) প্রাণধারণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া এই বৈচিত্র্যকে খর্ব করার কোন অধিকার মানুষের নেই।

(৪) মানবেতর জগতে মানুষের হস্তক্ষেপ সীমাহীন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে।

(৫) মানবজীবনের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছে। মানবেতর জগতের সমৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যার হ্রাস প্রয়োজন।

(৬) জীবনের উন্নতি এবং প্রয়োজনে অর্থনৈতিক এবং ভাবাদর্শমূলক পরিবর্তন আবশ্যক হয়।

(৭) ভাবাদর্শমূলক পরিবর্তন জীবনের গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায়, শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে বোঝায় না।

এখানে যে বাস্তুবিদ্যার কথা বলা হয়েছে তাকে প্রকৃতপক্ষে পরাতাত্ত্বিক বাস্তুবিদ্যা বা metaphysical ecology বলা চলে। গভীর বাস্তুবিদ্যায় এক নতুন বা বিকল্প বিশ্বদর্শনের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশগত সমস্যার মূলে যে কারণ আবিষ্কার করা হয়েছে তা দার্শনিক। তাই পরিবেশগত সমস্যার সমাধান আসতে পারে কেবলমাত্র আমাদের বিশ্বদর্শনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের স্বরূপ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, তত্ত্বের স্বরূপ ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় হয়। এই প্রশ্নগুলি পরাতাত্ত্বিক। এইভাবে গভীর বাস্তুবিদ্যা নৈতিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরাতাত্ত্বিক আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করে।

আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। সমষ্টির তুলনায় ব্যক্তিই এখানে বেশি মর্যাদা লাভ করেছে। গভীর বাস্তুবিদ্যা মানুষকে প্রকৃতির থেকে বিযুক্ত সত্তা বলে মনে করেনি। মানুষ প্রকৃতিরই একটি অঙ্গ। প্রকৃতি বা পরিবেশই মানবস্বরূপের নির্ণায়ক। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধকে বাদ দিলে মানুষের স্বরূপেরই পরিবর্তন হয়। গভীর বাস্তুবিদ্যা মানুষকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিযুক্ত ব্যক্তিতে (individual) পরিণত করেনি। একথার সরলার্থ হল— গভীর বাস্তুবিদ্যা বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে মানব ও মানবেতর— এই বিভাগ করেনি। এই অখণ্ড পরিবেশকে বলা হয়েছে 'total field'।

গভীর বাস্তুবিদ্যার যে নীতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে প্রাণের আপাত প্রাধান্য থাকলেও নায়েস ও সেশনস বলেছেন যে প্রকৃতির যে অংশ প্রাণহীন তার বিকাশ ও সমৃদ্ধিও এখানে বক্তব্য। আসলে যাঁরা গভীর বাস্তুবিদ্যার প্রবক্তা তাঁরা যে শুধু প্রাণিজগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা নন, তাঁরা মনে করেন যে এই বিশ্বে মানুষের জীবনের যা মূল্য অন্য প্রাণীর জীবনের মূল্য তার থেকে কম নয়।[২] তাঁদের মতে বিশ্বের সমস্ত পদার্থের বেঁচে থাকার এবং তাদের নিজের নিজের পরিপূর্ণতা লাভের অধিকার আছে। জীবনের বা অস্তিত্বের এই পরিপূর্ণতাই তাদের আত্মোপলব্ধি (self-realisation)।

গভীর বাস্তুবিদ্যা প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই মতবাদ দুটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে— 'Self-realisation' বা 'আত্মোপলব্ধি' এবং 'biocentric equality' বা 'প্রাণকেন্দ্রিক সাম্য'। মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বের সকল অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উপলব্ধি করে তখনই তার আত্মোপলব্ধি হয়। আর মানুষ যখন নিজেকে এবং অন্য সমস্ত পদার্থকে এক বিশাল সমগ্রের অংশ বলে মনে করে তখন প্রাণকেন্দ্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আসলে আমাদের মধ্যে দুটি সত্তা আছে— এক আমাতেই বদ্ধ, এক সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমার নিজস্ব বিশ্বাস, চাহিদা, স্বার্থবোধ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয়েছে

২. এর নাম 'biocentric equality'.

আমার ক্ষুদ্র আমি। আর যে আমি বিশ্বের সকল পদার্থের সঙ্গে একাত্ম তাই আমার প্রকৃত অন্তর্নিহিত সত্তা। এই বৃহৎ আমিকেই উপলব্ধি করতে হবে। তাই হবে প্রকৃত আত্মোপলব্ধি। এই উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে আর বিশ্ব থেকে বিযুক্ত বলে মনে করে না। সে নিজেকে আরও এক বিরাট বিশ্ব সত্তার অংশ বলে মনে করে। জীব ও অজীবের মধ্যে, আত্ম ও পরের মধ্যে, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সকল ভেদ লুপ্ত হয়ে মানুষ তার সত্তার বিরাটত্বকে উপলব্ধি করে।

গভীর বাস্তুবিদ্যার অপর আদর্শকে বলা হয়েছে প্রাণকেন্দ্রিক সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদ একটি মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই অন্তর্দৃষ্টি প্রচলিত ধারণার বিরোধী— যে ধারণায় মানুষের জীবনকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় এবং তার বিকাশের অধিকারকেই অন্যান্য বস্তুর বিকাশের অধিকারের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু গভীর বাস্তুবিদ্যা মনে করে যে এই বিশ্বে সকল বস্তুর জীবনধারণের সমান অধিকার আছে। স্বগতমূল্যে সকলেই সমান মূল্যবান।

গভীর বাস্তুবিদ্যার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। **প্রথমত,** বলা হয়েছে যে মানুষ, জন্তু, ঘাস প্রভৃতি একই বিশ্বের অংশ হতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, তাদের সকলেরই সমান স্বগতমূল্য আছে। আমরা মনে করতে পারি যে প্রতিটি প্রাণীরই এই বিরাট বাস্তুতন্ত্রে একটি ভূমিকা আছে; প্রতিটি প্রাণীর উপরেই অন্য প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে। তবুও সকল প্রাণীর মূল্য যে সমান হবে এমন কথা বলা যায় না। ব্যক্তির মূল্য সমগ্রের মূল্যের উপর নির্ভর করে, যদিও একথাও সত্য যে সমগ্রের মূল্য ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। তাই ব্যক্তির নিজস্ব মূল্য কতখানি তা সন্দেহের বিষয়।

দ্বিতীয়ত, গভীর বাস্তুবিদ্যায় কার মূল্য প্রধান— ব্যক্তির অথবা প্রজাতির? এই প্রশ্নটি অবান্তর নয়। তার কারণ বাস্তুবিজ্ঞান বিশ্বকে একটি অখণ্ড বাস্তু বা নিবাস বলে মনে করে। সুতরাং বাস্তুনীতি বিদ্যা প্রজাতির পক্ষেই প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। ব্যক্তির প্রসঙ্গ এখানে প্রধান নয়। বাস্তুতন্ত্র একটি সামগ্রিক ধারণা। প্রজাতির ধারণাটিও সামগ্রিক। প্রজাতি নানা ব্যক্তির সংগ্রহ নয়। একটি প্রজাতির অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষিত হলে প্রজাতির স্বার্থ সংরক্ষিত হয় না। প্রজাতির একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে; তার স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। ব্যক্তি নয়, প্রজাতিই আমাদের নৈতিক আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

গভীর বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে। এই বাস্তুবিদ্যা আত্মোপলব্ধিকে জীবনের লক্ষ্য বা অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বা একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে আত্মোপলব্ধির কথা বলা সম্ভব হলেও, বিশ্বের যে অংশ প্রাণহীন তার আত্মোপলব্ধিকে আমরা কিভাবে বুঝব? কোন কোন